খায়রুল আনাম এবং শিরীন আনামঃ

আমাদের নাম খায়রুল আনাম এবং শিরীন আনাম, আমরা স্বামী-স্ত্রী গত বেয়াল্লিশ বছর ধরে বিবাহিত। আমার জন্ম ১৯৫২ সালে, ডাকনাম শাহীন। শিরীনের জন্ম ১৯৬২তে, ডাকনাম পারু। আমরা এখন হান্টিংডনে থাকি। নরউইচ ছেড়ে যাবার পরেও আমরা প্রতি মাসে একবার অন্তত আসতাম, সুযোগ পেলেই আসি।

গত দশ-বারো বছর ধরে নরউইচে আমরা পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছি। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাঙালি পরিবারগুলোর মধ্যে অনেক মেলামেশা হয়। গত দুই তিন বছর যাবত আমরা পিঠার আয়োজন করি, লোকে পিঠা বানিয়ে আনে, আমরা সবার সঙ্গে পিঠা ভাগ করে খাই। আমি এই পারিবারিক সাংস্কৃতিক মিলনমেলার নেপথ্যে সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকি। প্রথমদিকে আমরা প্রভাবকের ভূমিকায় ছিলাম, শুরুতে আমরা চার পাঁচজনের পরিবার মিলে আমাদের বাড়িতেই এই বৈশাখী অনুষ্ঠান শুরু করি। তারপর দেখি এ অনুষ্ঠান এত মানুষের সমাবেশে পরিণত হচ্ছে যে আমাদের পক্ষে সামলানো শক্ত, রান্নাবান্না-ধোয়ামোছা- পরিষ্কার করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তখন আমরা ঠিক করলাম একটা হল ভাড়া করে সেখানে এই অনুষ্ঠান করা হবে, ওভাবেই শুরু হলো ব্যাপারটা।

আমি স্ত্রী আর তিন সন্তান নিয়ে ১৯৯৪ সালের ১৯শে জুন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে এসেছিলাম, প্রত্যেকের হাতে একটা স্যুটকেস আর একটা হাতব্যাগ। এর আগে একবার ছুটি কাটাতে এসেছিলাম ১৯৮২ সালে বিয়ের পর। ভালো শিক্ষা, ভালো জীবন ইত্যাদির জন্য আমরা যুক্তরাজ্যে বাস করতে উদ্‌গ্রীব ছিলাম। আসবার পর পরিবারকে লন্ডনে রেখে বাসস্থানের খোঁজে কিছুদিনের জন্য অ্যাবার্ডিন যাই, বাসা পাই, তারপর ওরা আমার সঙ্গে অ্যাবার্ডিনে এসে যোগ দেয়। বাংলাদেশ থেকে চাকরি স্থানান্তর করে আমি যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চলে আসি, সে অঞ্চলে তখন এমন শীত ছিল—অথচ তখন জুনের শেষদিক। ভীষণ ঠান্ডা লাগত। আমি পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি পেয়েছিলাম। জুনে এলাম, ডি.এফ.টিতে অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রান্সপোর্টের অ্যাবার্ডিন অফিসে যোগ দিলাম। এই চাকরি আমার পরিবার আর আমাকে যুক্তরাজ্যে একসঙ্গে থাকবার সুযোগ করে দিল। আমার শুরুটা অ্যাবার্ডিনে, জব রিলোকেট করে। তিন বছরের অ্যাবার্ডিনবাস, এমন ঠান্ডা যে আমরা ভাবলাম যাই দক্ষিণাঞ্চলে থেকে আসি। এরপর গেলাম লন্ডন আর কেন্টে অর্থাৎ অরপিংটন অফিসে, তারপর টনব্রিজে। বছর দুয়েক ওখানে থেকে দেখলাম নরফোকের গ্রেট ইয়ারমাউথে একটা কাজের সুযোগ হচ্ছে। ফলে গ্রেট ইয়ারমাউথ অফিসে এলাম, নরউইচে একটা বাড়ি কিনলাম। নরউইচের বাড়িতে এসে উঠলাম ১৯৯৯ সালের ১২ নভেম্বর, তারপর থেকে ২০২১ সালের ২৯শে জুন পর্যন্ত, প্রায় বাইশ বছর নরউইচে একটানা থেকেছি।

আগেও নরউইচ ছোট্ট একটা শহরই ছিল, আরো নির্জন চুপচাপ। এশীয় লোক বা ধনী মানুষ আশপাশে কম ছিল। এত নানান জাতের মিশেলও ছিল না, এত কসমোপলিটান ছিল না

শহরটা। স্থানীয় মানুষরা গুটিয়ে থাকতো, অন্য জাতের লোক দেখলে তেমন কথাবার্তা বলতো না। নিজেদের নিয়ে মশগুল থাকতো, নরফোকবাসীদের উচ্চারণও একেবারে আলাদা ছিল, বুঝতে আমাদের বেশ অসুবিধা হয়েছে। তবে, সব মিলে মানুষ ভালো ছিল, এগিয়ে গিয়ে নিজ থেকে কথা বললে ঠিকই কথা বলতো। একে একে অনেক মানুষ চাকরিবাকরি নিয়ে এখানে এলো। আগে এত ঘরবাড়ি ছিল না, এখন যেমনটা সর্বত্র দেখি, এমনকি সবুজ মাঠের মাঝখানেও দেখি বাড়িঘর। অপরাধপ্রবণতার দিক থেকে, এখনো এটা ভালো অঞ্চল, তেমন অপরাধ ঘটে না। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কম ছিল, কারণ অপরাধ কম ছিল, গাড়িচুরি কম হতো, ডাকাতি কম হতো।

এখন আমরা হান্টিংডনে আমাদের মেয়ের কাছাকাছি থাকি। আমাদের নাতি মিখাইলের বয়স দশ, আর আমার নাতনি জারার বয়স সাড়ে পাঁচ। ওদের খুনসুঁটি ঝগড়া বিবাদ দৌড়ঝাঁপ দেখে আমাদের নিজেদের শৈশবের কথা, সন্তানদের শৈশবের কথা মনে পড়ে। ওদেরকে স্কুলে নিয়ে যাই নিয়ে আসি অনেক সময়। সপ্তাহে অন্তত তিনবার ওরা আমাদের দেখতে আসে, সময় কাটায় আমাদের সঙ্গে, এলে আর যেতে চায় না।

শিরীনরা তিন ভাইবোন। আমরা চার ভাইবোন। আমার জন্ম ঢাকায়, তবে জন্মের এক বছর পরে বাবার কর্মসূত্রে আমরা চট্টগ্রাম চলে যাই। আমার স্কুলজীবন, কলেজজীবন, খেলাধুলা, মেরিন একাডেমিতে যোগদান, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান সবই চট্টগ্রামে। গণিত ভালো লাগতো না স্কুলে। ফুটবল, ক্রিকেট, জিমনেসিয়াম, সবই ভালো লাগতো। ক্লাস নাইনে অনেক কিছু শিখেছিলাম—ধাতুর কাজ, কাঠের কাজ, ইলেকট্রিক্যাল কাজ। ক্যাডেট হিসেবে সমুদ্রে গিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরলাম, ১৯৭৩ সাল থেকে আমি জাহাজে জাহাজে প্রায় ৩ বছর ঘুরেছি। তারপর যুক্তরাজ্যে এলাম সার্টিফিকেট এবং লাইসেন্সের জন্য। নিউক্যাসলের কাছে সাউথশিল্ডসে পড়তে এসেছিলাম, তারপর আবার চট্টগ্রামে ফিরে গেলাম। আমার বাপ-মা যদিও সিলেটের, আমি বড় হয়েছি চট্টগ্রামে। শিরীনও তাই।

আমার বাবা-মা ছিলেন আদর্শ অভিভাবক। বাবা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সৎ সরকারি চাকুরে ছিলেন, মিটিয়রলজিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। মাইনের বাইরে আর কোনো রোজগার ছিল না, মায়ের হাতে পুরোটা তুলে দিয়ে বাবা নিশ্চিন্ত। মা ঐটুকু টাকা দিয়েই সংসার চালাতেন, খুব চুপচাপ ধরণের মানুষ ছিলেন, কখনো বকা দিতেন না। বাবা ছিলেন আমার রোল মডেল, আমি তাঁকে অনুসরণ করতাম। বাড়িতে বাবার কঠোর অনুশাসন চলতো, মা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজ আর আমার বাবা-মা বেঁচে নেই।

শিরীনের পারিবারিক পরিমন্ডলও একই রকম ছিল। শিরীনের বাবাও সরকারী অফিসার ছিলেন, পুলিশ অফিসার ছিলেন, বদলীর চাকরি। নয়-দশ বছর বয়সে ওরা মায়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করলো। শিরীনের বাবা ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি জায়গায়

ঘুরেফিরে কাজ করতেন। শিরীনের বাবা-মা অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ বাবা-মা ছিলেন, কখনো রাগ করে কথা বলতেন না, বাড়ির আবহাওয়া ছিল নিরুদ্বেগ- স্বচ্ছন্দ। বাবা মা ভাইবোন মিলে হেসে খেলে আনন্দ করে শৈশব কাটিয়েছে। রাত আটটায় রাতের খাবার খেতে বসলে কেবল জিজ্ঞেস করতেন—আজ পড়াশোনা শেষ করেছ তো? শিরীনের বাবা ওকে ওঁর বোর্ডিং স্কুলের গল্প বলতেন, খাবারের অনটন ছিল সেখানে, অনেকসময় আনারস দিয়ে ভাত খেতে হতো। শিরীনের মা অবশ্য অল্পতে রেগে যেতেন, দুষ্টুমি করলে মায়ের বকুনি থেকে আশ্রয় পেতে ওরা বাপের কাছে লুকাতো। শিরীনের মা খুব ভালো রান্না জানতেন, হাতের কাজ, সেলাইফোঁড়াই।

ভাইবোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আমার ভাই সৌদি আরবে ডাক্তার হিসেবে কাজ করার পর আমেরিকায় ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন ১লা জুলাই ১৯৯৪, একই দিনে আমি যুক্তরাজ্যে ডিএফটিতে কাজ শুরু করি। ২০২০ সালের ২০ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ভাইয়ের স্ত্রী আর তিন ছেলে এখনো আমেরিকায় থাকে। বাংলাদেশে আমার দুই বোন আর তাঁদের স্বামীরা থাকেন—সন্তানসন্ততি নাতিনাতনি নিয়ে বড় সংসার। সবার সঙ্গে আমাদের গভীর সদ্ভাব রয়েছে, বছরে একবার অন্তত দেশে যাই, কখনো দুবার। শিরীনের ভাইবোনরা ঢাকা থাকেন। মা থাকেন ভাইয়ের সঙ্গে।

বাংলাদেশে আমি জন্মের পর থেকে ৪২ বছর বসবাস করেছি, মাঝে দুই বছর সুইডেনে ছিলাম, আর দুই বছর যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে এসেছি। তখন শিরীনও এসেছিল আমার সঙ্গে ১৯৮৪ সালে, আমাদের ছেলে আদিলের তখন এক বছর বয়স। আমি পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, ছেলের সমস্ত দেখাশোনা- বাসার কাজকর্ম- বাজারসদাই- রান্নাবান্না শিরীনকে করতে হতো। বেশ কঠিন সময় ছিল। একবারে সব পাশ করলাম, সার্টিফিকেট অভ কমপিটেন্সি পেলাম। শিরীনের সহায়তা ছাড়া এসব সম্ভব হতো না। যখন দুজন ছিলাম তখনো জাহাজে থাকাকালীন শিরীন রান্না করতো, কেক বেক করতো, চা-কফি-কমলার রস বানাতো আমার জন্য।

আদিল, রুমানা আর রাইসা আমাদের তিন ছেলেমেয়ের নাম। শান্তশিষ্ট ছেলেমেয়ে ওরা, গানের শিক্ষক রেখে ওদের আমরা গান শিখিয়েছি। অবশ্য ওরা গানবাজনা ভুলে গেছে। রাইসা তেমন পারে না, তবে আদিল আর রুমানা বাংলায় কথা বলতে পারে, বাংলাদেশী খাবার খায়, দেশীয় খাবার রান্না করতে পারে। প্রত্যেকে গ্র্যাজুয়েট, প্রত্যেকে কাজ করছে। আদিল আইটি অ্যানালিস্ট, রুমানা স্ট্রাইকার মেডিক্যাল ডিভাইসেস কোম্পানিতে কাজ করছে, রাইসা কাজ করছে জনসন অ্যান্ড জনসন লন্ডনে।

আমাদের চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ অবশ্যই আমাদের দেশ, বাংলাদেশ। ১৯৭৩এ আমি সাউথ আফ্রিকা গিয়েছিলাম, দশ দিন ছিলাম। চমৎকার জায়গা। নেটিভদের সঙ্গে যদিও অনেক সংঘাত চলছিল তখন, কিন্তু মানুষ সেখানে খুবই বন্ধুবৎসল। সাউথ আফ্রিকাতে বাসের গায়ে লেখা দেখেছি শ্বেতাঙ্গদের জন্য, অ-শ্বেতাঙ্গদের জন্য, ব্যাংকের

কাউন্টারেও তাই, হাসপাতাল কিংবা স্কুলেও তাই। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। খুবই বেদনাদায়ক। এছাড়া মরিশাসে গেছি, মিশরে বেড়াতে গেছি, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড গেছি। শিরীনের অবশ্য সবচেয়ে ভালো লেগেছে থাইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গিয়ে, সবাই মিলে গেছিলাম। জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে বহু দেশ ঘুরেছি। ১৯৮৬ সালে সমুদ্রকে বিদায় জানাবার পর, উড়োজাহাজেই গেছি বিভিন্ন দেশে। তবে আজো সাউথ আফ্রিকার সৌন্দর্য ভুলতে পারি না।

প্রাইমারি স্কুলের বহু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, চিটাগাং কলেজের অনেক বন্ধুর সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ফেসবুক আর হোয়াটস্যাপের কল্যাণে অনেকের সঙ্গে এই যোগাযোগ রাখতে পেরেছি। দেশে গেলেই একসঙ্গে আড্ডা, ডিনার ইত্যাদির আয়োজন করি। পুরনো বন্ধুদের এই চক্র নিয়ে আমি গর্বিত। শিরীনের অবশ্য অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বলে বন্ধুদের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই, ওর এখন একটিমাত্র বন্ধু, কে সেটা সহজেই অনুমেয়।

বিয়ের স্মৃতি বলতে, শিরীন বিয়ের শাড়িটা খুঁজে পায়নি বলে দ্বিতীয় শাড়িটা নিয়ে এসেছে। বিয়ের শাড়ি হতে হতো লাল। দ্বিতীয় শাড়ি বলতে পিওর সিল্কের এই শাড়িটা, যেমন নরম, তেমন হালকা। বিয়ের বছর দুয়েক আগে আমার জাহাজ মাদ্রাজে থেমেছিল, তখন বিয়ের জন্য কিছু শাড়ি কিনে রেখেছিলাম। আজ ৪২ বছর ধরে শাড়িটা শিরীন যত্ন করে রেখেছে। আমাদের বিয়ের ঘটকালির উদ্যোগ নিয়েছিলেন আমার এক খালা আর এক মামী যিনি শিরীনের বাবার বন্ধুর স্ত্রী। এক বিয়েবাড়িতে আমাদের দেখা হবার কথা ছিল, হয়নি। পরে শিরীনের মা-বাবা বাড়িতে নেই এমন দিনে আমি- আমার মা- খালা- মামী মিলে ওদের বাড়িতে চা খেতে যাই। এভাবেই পরিচয়। বাকিটা পারিবারিকভাবে সম্পন্ন হয়। আমাদের আকদ হয় ৭ এপ্রিল, ১৯৮০। আকদের পরে আমি জাহাজে চলে যাই, পরে আয়োজন করে বিয়ে হয় ২৬শে অক্টোবর, ১৯৮০। বিয়ের পর আমার মা তাঁর নিজ হাতে ক্যানভাসের ওপর উলে বোনা একটা বিশাল জায়নামাজ দিয়েছিলেন, অত বড় জায়নামাজ বুনতে ওঁর কত দিন লেগেছিল কে জানে!

শিরীন এখানে ইন্টারপ্রেটার এবং ট্রান্সলেটর হিসেবে কাজ করে। কত রকম মানুষের কত রকম অবিশ্বাস্য গল্প ওকে শুনতে হয়, জানতে হয়। শিরীনের জীবনের শিক্ষা বলতে— সহিষ্ণুতা আর সমর্পণ। আমার জীবনের শিক্ষা, মানুষকে সম্মান দেয়া, সম্মান দিলে সম্মান ফেরত আসে। আর হয়তো বিশ্বাস, সরকারী কাজে জাহাজের কাস্টমারদের বেলায়, পারস্পরিক বিশ্বাস একটা বড় ব্যাপার। নানান ঘাটের নানান মানুষ দেখেছি জীবনে, সেই বৈচিত্র থেকেও জীবনে অনেক শিখেছি। সাউথশিল্ডসে ১৯৮৪তে আমি ক্যাপ্টেনের সার্টিফিকেট পাই, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করলে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি চাকরি ছাড়ি, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিই। শিপিং ম্যানেজমেন্টে এমএসসি করার জন্য ওরা আমাকে সুইডেনে পাঠায়। সুইডেন থেকে ফিরে এসে

আমি জেনারেল ম্যানেজার হই। সেই চাকরি ইস্তফা দিয়ে আমি যুক্তরাজ্যের ডিএফটিতে শিপ সার্ভেয়র- ইন্সপেক্টর এবং সী-ফেয়ারারদের একজ্যামিনার হিসেবে যোগদান করি।

গত ২৮ বছরে যুক্তরাজ্য আগের চেয়ে অনেক সহনশীল হয়ে উঠেছে। সাউথশিল্ডে পড়াকালীন কিছু বর্ণবাদী ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছি, ডিএফটিতে আইনের কড়াকড়ি ছিল—মানুষের ব্যবহার ছিল চমৎকার। বৈষম্য একটা দেশের উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটায়, সামাজিক সম্প্রীতির অবনতি ঘটায়। আরেকটা পরিবর্তনের কথা বলবো—আগে আমরা বাইরে যেতাম ফিশ অ্যান্ড চিপস বা চিকেন অ্যান্ড চিপস খেতে, এখন যাই কারি খেতে।

জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন শিরীন বলে—ওর বিয়ের দিন। আমি বলবো, আমার ক্যাপ্টেনস সার্টিফিকেট পাশ করার দিন।